ভোটার তালিকার ভুতের সন্ধানে

আ হ্ সা ন মো হা ম্ম দ

সম্প্রতি ঘোষিত ভোটার তালিকা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। এখানে সবকিছুই বিতর্কিত। কারো ছেলে হলে বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে ছেলেটি আসলে তার কিনা। কারো বাড়ীতে আগুন লাগলে বির্তক সৃষ্টি হয় যে আগুন কি দুর্ঘটনা বশতঃ লেগেছে না কি রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ বাড়ীর বাসিন্দাদেরকে সপরিবারে হত্যা করার জন্য আগুন দিয়েছে। বিতর্কিত কোন লেখক সুদূর প্রবাসে নিজকক্ষে মৃত্যুবরণ করলে বিতর্ক হয় যে তিনি কি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন না দেশের কোন রাজনৈতিক নেতা চর পাঠিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এ সকল বিতর্কের কিছু কিছুর যেমন কোন ভিত্তি থাকে না, ঘোলা পানিতে মৎস শিকারের জন্য কেউ কেউ সেগুলো সৃষ্টি করে থাকে, তেমনি আবার কিছু কিছু বিতর্কের পিছনে সত্যি সত্যিই কোন ঘটনা থাকে। তবে সাধারণ মানুষ, যাদের কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা থাকে না, কোন দল ক্ষমতায় গেল কি গেল না তা নিয়ে যারা মাথা ঘামায় না, তাদের এসব বিতর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক নিয়ে সকলেই শঙ্কিত, কেননা এ বিতর্কের অবসান না হলে আগামী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে এবং তা দেশের জন্য মারাত্মক সংকট বয়ে আনবে।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের মূলে রয়েছে ২০০০ সালে প্রণীত পূর্ববর্তী তালিকা থেকে ভোটার সংখ্যার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি। ২০০০ সালে যেখানে ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৫৯%, বর্তমানে তা দাড়িয়েছে ৯.১৩ কোটি যা বর্তমানের মোট জনসংখ্যার ৬২%। অনেকেই এ বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলছেন এবং এর কারণ হিসাবে প্রচুর সংখ্যক ভুয়া ভোটারের অর্ন্তভূক্তিকে সন্দেহ করছেন।

বিষয়টি কতটুকু অস্বাভাবিক তা বুঝতে পরিসংখ্যানের সূত্র ও তত্বে যাবার আগে নিজের পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকালাম। পিতা-মাতা, দুই ভাই ও তাদের স্ত্রী ও ৩টি সন্তান নিয়ে আমাদের পরিবার। সর্বমোট সদস্য ৯ জন, যার মধ্যে ভোটার ৬ জন। অর্থাৎ পরিবারের জনসংখ্যার ৬৭% ভোটার। আমরা দুই ভাইই বিয়ে করেছি ২৫ বছর বয়সে এবং বিয়ের পর পরই বাচ্চা নিয়েছি। দেরী করে বিয়ে করলে বা দেরীতে বাচ্চা নিলে পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা কম হতো ও ভোটারের হার আরও বেড়ে যেতো। পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘজীবি হওয়ার কারনেও ভোটারের সংখ্যা বেড়ে যায়। দাদা-দাদী বেঁচে থাকলে তাঁদের বয়স হতো যথাক্রমে ৮০ ও ৭৫। সেক্ষেত্রে ভোটারের হারও বেড়ে যেতো। উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা সেবা ও পুষ্টি মাত্রার উন্নতির কারণে এই বয়সী মানুষের সংখ্যা এখন বাড়ছে। অপর দিকে যদি আমরা অনেকগুলো সন্তান নিতাম, তাহলে পরিবারের মোট সদস্যের তুলনায় ভোটারের সংখ্যা কমে যেতো। ফলে দেখা যাচ্ছে যে জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটারের হার যে সব কারণে বাড়ে তা হচ্ছে ক. অতীতের তুলনায় জন্মহার কমে যাওয়া খ. বিলম্বে বিবাহ ও বিলম্বে সন্তান নেয়া গ. প্রাপ্তবয়স্কদের দীর্ঘজীবি হওয়া। বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে এই বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে। ভোটারের সাথে জনসংখ্যার অনুপাতের ক্রমাগত বৃদ্ধি তার ফল হতে পারে।

এখন দেখা যাক পরিসংখ্যানের হিসাবে বিষয়টি কি দাড়ায়।

সাল	জনসংখ্যা	১৫-৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত	৬৪ বছরের বেশী বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত	ভোটার সংখ্যা	অনুপাত
১৯৯৫	১১.৫০ কোটি	৫৭%	৩%	৫.৬০ কোটি	৪৭%
২০০০	১৩ কোটি	৬১.৬%	৩.৩৬%	৭.৭৩ কোটি	৫৯%
২০০৬	১৪.৭৩ কোটি	৬৩.৬%	৩.৫%	৯.১৩ কোটি	৬২%

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৫ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ১৫ বছরের উর্দ্ধের জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে চলেছে, যা আমাদের পূর্বের বক্তব্য সমর্থন করে। এই বৃদ্ধির সাথে বর্তমান তালিকার ভোটার-জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির হার সামঞ্জস্যশীল। সে হিসাবে ভোটারের হারের বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। মনে হচ্ছে, যারা ভোটার তালিকায় ভুতের অস্তিত্ব দেখছেন তারা এই পরিসংখ্যানের এই দিকটি বিবেচনা করেন নি।

তাছাড়া আরও কয়েকটি কারণে ভোটার সংখ্যা আইনানুগভাবে বাড়তে পারে, যেমন এই প্রথম কারাবন্দীদেরকে ভোটার করা হয়েছে, যাদের সংখ্যা ১২ লক্ষের মত। নির্বাচন কমিশন বলছে যে এবারেই প্রথম ভাসমান জনগোষ্ঠীকে ভোটার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানেও ১৫-২০ লাখ ভোটার বেশী হতে পারে। ভোটার তালিকার ভুতগুলো চিহ্নিত করতে এ সকল বিষয়ও মাথায় রাখতে হবে।

তবে ভুয়া ভোটার যে তালিকাতে নেই বা ভুয়া ভোটারের সংখ্যা যে বাড়ে নি তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। জ্ঞান হবার পর থেকে যতগুলো নির্বাচন দেখেছি, সব নির্বাচনেই ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটার থাকা এবং তাদের ভোট দেবার অভিযোগ শোনা গেছে। যে সকল উপায়ে ভুয়া ভোটারকে তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয় তা হচ্ছে - ক. এই ব্যক্তিকে একাধিক স্থানে ভোটার হিসাবে দেখানো; খ. যাদের ভোটার হবার বয়স হয়নি, তাদেরকেও ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা; গ. মৃত ব্যক্তিদেরকে ভোটার দেখানো। একেবারেই অস্থিত্বহীন ব্যক্তিকে ভোটার বানানোর ঘটনা তেমনিটি দেখা যায় না। যেহেতু দিন দিন মানুষের শহরমুখো হবার প্রবণতা বাড়ছে, তাই একই ব্যক্তিকে একাধিক স্থানে ভোটার হিসাবে দেখানোর কারণে ভুয়া ভোটারের পরিমাণ আগের থেকে বৃদ্ধি পেতে পারে। ভোটার তালিকা প্রণয়ণের জন্য আমাদের দেশে যে ধরণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাতে এই ধরণের ভুয়া ভোটার রোধ করা কতটুকু সম্ভব তা বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। শতভাগ নির্ভুল ভোটার তালিকার জন্য নাগরিক পরিচয়পত্রের প্রচলন করতে হবে। তাতে একদিকে যেমন ভোটার তালিকা প্রণয়ণের অর্থ বেচে যাবে, এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অন্তরায় সৃষ্টি হবে না, তেমনি জঙ্গীবাদ ও অপরাধ দমনও সহজতর হবে।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক যতটা না তালিকার কারণে, তার থেকে অনেক বেশী নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার জন্য। কমিশনের অবস্থাকে সকলেই একবাক্যে হ-য-ব-র-ল বলে অভিহিত করছেন। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নির্বাচন কমিশনারদের কাছে যাচ্ছেন। প্রকৃত অবস্থা জাতিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলে অনেক ভুল বুঝাবুঝির

অবসান হতো। কিন্তু তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বসেও কিভাবে তাঁরা এ ধরণের বালখিল্যতা দেখাতে পারেন, তা সত্যিই কল্পনার অতীত। এ অবস্থার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মিডিয়াফোবিয়া সবথেকে বেশী দায়ী। বেচারা কাজ করতে গিয়ে যতটা না ভুল করছেন, তার থেকে তাঁকে বেশী ব্যর্থ মনে হচ্ছে তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তির কারণে। শুধু বিরোধী দলই নয়, সরকারের শুভাকাঙ্খীরাও তার পদত্যাগ চাচ্ছেন। যেহেতু এটি একটি সাংবিধানিক পদ, তাই তিনি পদত্যাগ না করলে সরকার তাকে সহজে বাদ দিতে পারে না। তাতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকট বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে।

এদিকে কমিশনের আর্থিক সংকটও সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নিয়মানুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা সময়মত বিভিন্ন দর্শণীয় স্থানে টাঙ্গানোর কথা থাকলেও অর্থের অভাবে কমিশন তা করতে পারেনি। অর্থাভাবে তালিকা মূদ্রিত হয়েছে প্রযোজনের তুলনায় অনেক কম। এজন্য কমিশন থেকে বলা হচ্ছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয় সময় মত অর্থছাড় না করায় তারা অর্থ সংকটে পড়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে আগে ছাড়কৃত অর্থ খরচের হিসাব না দেখানো হলে তারা অর্থছাড় করতে পারে না। অর্থ ছাড়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কিছু নিয়ম রয়েছে যেগুলি কর্মকর্তাদেরকে মানতে হবে। সে সকল নিয়মের ব্যাত্যয় করতে হলে সরকারের উচ্চ মহলের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনারেরই উদ্যোগ নেয়ার কথা। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অপরদিকে সরকার দলীয় শীর্ষনেতাদেরও এ বিষয়ে কোন উদ্বেগ বা উদ্যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কে বিরোধী দলের অবস্থান বিষয়টিকে আরও গুলিয়ে ফেলেছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী ও অন্যান্য নেতারা বলছেন যে, ২ কোটি ভুয়া ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০০০ সালে প্রণীত ভোটার তালিকা থেকে বর্তমানের ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৩ হাজার। বিরোধী দলের দাবী সঠিক হলে বর্তমানে ভোটারের সংখ্যা ২০০০ সালের থেকেও ৫০ লক্ষ কম হতে হবে। যেহেতু জনসংখ্যার ৬০% শতাংশের মত ভোটার, তাই এর অর্থ হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা গত পাঁচ বছরে ১ কোটি কমে গেছে। যিনি আগামীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চাচ্ছেন তাঁর যদি এটুকু অংক জ্ঞান না থকে, তাহলে তো জাতির সামনে অন্ধকার। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আরও যে সকল অভিযোগ করা হচ্ছে, তাঁর মধ্যে রয়েছে, তাদের অনেক নেতাকে ভোটার তালিকাতে রাখা হয়নি। অভিযোগটি নতুন নয়, ভোটার তালিকা তৈরীর জন্য যখন মাঠকর্মীরা কাজ করছিলেন, তখনই এ অভিযোগ উঠেছিল। টিভি চ্যানেরগুলো দুপক্ষের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বলেছিলেন যে, বিরোধী দলের সংশ্লিষ্ট নেতাদের বাসায় তাঁরা বহুবার গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানিয়েছেন যে, ভোটার তালিকার ব্যাপারে ইতিবাচক দলীয় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভোটার হবেন না। বিরোধী দলীয় নেতারাও তা স্বীকার করেছিলেন। একজন এমপিকে ভোটার তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃত বাদ দেয়ার মত বোকামী কেউ কি করতে যাবে? ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটারের বিষয়টি মাত্রারিক্ত অতিরঞ্জিত করা ও এর সাথে হাস্যকর কিছু বিষয়কে অর্ন্তভূক্ত করার মাধ্যমে বিরোধী দল প্রকারান্তরে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যাতে সাধারণ মানুষ এটিকে তাদের অন্য হাজারো রাজনৈতিক কুট কৌশল হিসাবে দেখছে। এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভুয়া ভোটার বাদ দেয়ার জন্য কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টি তেমন কার্যকর নাও হতে পারে।

নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। তা যেন কোন ভাবেই সংশয়যুক্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আশা করি, তাঁরা মিডিয়াভীতি ও পলায়নী মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে জাতিকে

প্রকৃত অবস্থা অবহিত করবেন এবং তালিকাতে কোন সমস্যা থাকলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেবেন। যেহেতু নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন নয়, তাকে পদে পদে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের দ্বারস্থ হতে হয়, তাই প্রধানমন্ত্রীকেও উদ্যোগ নিতে হবে কমিশনকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের। তবে কমিশন যাতে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে চলতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। সে বিষয়টি আবার আটকে গেছে আমাদের নেতাদের শুচিবাই এর কারণে। সেক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের ছায়া যাতে না মাড়াতে হয় সেভাবে সংলাপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য ভিডিও কনফারেন্সিং এর মত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য করবে। যেভাবেই হোক আগামী নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হয় তার জন্য সকলে মিলে কাজ করার কোন বিকল্প নেই। দেশের কর্ণাধারেরা বিষযটি সময়মত না বুঝলে সকলকেই সেজন্য খেসারত দিতে হবে।